# তেমুজিন

## এক অপরাজিত মহাকাব্যের নাম

রচনা ও সংকলন
মো. নাজমুল হোসেন

**Email:naj302190@gmail.com**

প্রকাশকাল:৩০ জানুয়ারী ২০২৬

# ভূমিকা

ইতিহাসের পাতায় এমন কিছু নাম থাকে, যা শুনলে একই সাথে আতঙ্ক এবং বিস্ময় জাগে। ‘চেঙ্গিস খান’ তেমনি একটি নাম। কেউ তাঁকে দেখেছেন ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে, আবার কেউ তাঁকে মনে করেন আধুনিক বিশ্বের অন্যতম রূপকার। মধ্য এশিয়ার ধূলিধূসরিত স্তেপ অঞ্চল থেকে উঠে আসা এক অনাথ বালক কীভাবে পৃথিবীর ইতিহাসের বিশালতম নিরবচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, সেই গল্প কোনো রূপকথাকেও হার মানায়।

এই বইটির লক্ষ্য কেবল একজন যোদ্ধার জয়গাথা বর্ণনা করা নয়, বরং তেমুজিন নামের এক সাধারণ বালকের ‘চেঙ্গিস খান’ হয়ে ওঠার পেছনে থাকা অদম্য জেদ, নিষ্ঠুর বাস্তবতা এবং অভাবনীয় দূরদর্শিতাকে তুলে ধরা। যখন তাঁর নিজের গোত্র তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল, যখন তাঁর পরিবার অনাহারে দিন কাটিয়েছে, তখন থেকেই তিনি শিখেছিলেন যে এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে শক্তির বিকল্প নেই।

১.৫ লক্ষ শব্দের এই সুবিশাল ক্যানভাসে আমরা ভ্রমণ করব ১২ শতকের সেই দুর্গম মঙ্গোলিয়ায়, যেখানে বাতাসের সাথে তীরের শাঁ শাঁ শব্দ আর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ মিশে থাকত। আমরা দেখব তাঁর সামরিক প্রতিভা, তাঁর কঠোর আইন ‘ইয়াসা’ এবং কীভাবে তিনি পূর্ব থেকে পশ্চিমে এক সুবিশাল বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সেতু তৈরি করেছিলেন। চেঙ্গিস খান কেবল রক্তপাত করেননি, তিনি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন সে আমলের ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থাকে।

মঙ্গোলিয়ার সেই রহস্যময় ‘নীল নেকড়ে’র উত্তরসূরির জীবনের গহীনে প্রবেশের এই এক রোমাঞ্চকর যাত্রা। আশা করি, পাঠকরা এই বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ইতিহাসের এক নতুন দিগন্ত খুঁজে পাবেন।

মো. নাজমুল হোসেন
৩০ জানুয়ারি, ২০২৬

## স্তেপের পটভূমি ও তেমুজিনের জন্ম

১২ শতকের মঙ্গোলিয়া ছিল এক অশান্ত ও রক্তক্ষয়ী ভূমি। বিশাল এই মরুপ্রান্তর আর পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বাস করত শত শত মঙ্গোল গোত্র। তাদের মধ্যে কোনো একতা ছিল না; ছিল কেবল একে অপরের পশু চুরি, নারী অপহরণ আর রক্তের বদলে রক্ত নেওয়ার উন্মাদনা। এই রুক্ষ আবহাওয়া আর নিষ্ঠুর সমাজই তৈরি করেছিল চেঙ্গিস খানের ভিত্তি।

তেমুজিনের জন্ম ও অলৌকিক লক্ষণ

১১৮২ সালের কোনো এক সময় (মতান্তরে ১১৬২) অনোন নদীর তীরে খামাগ মঙ্গোল গোত্রের নেতা ইয়েসুগাইয়ের ঘরে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। শিশুটির নাম রাখা হলো তেমুজিন। লোকগাথা অনুযায়ী, জন্মের সময় তেমুজিনের ডান হাতের মুঠোয় ছিল একটি জমাটবদ্ধ রক্তের পিণ্ড। যা দেখে সেই আমলের জ্যোতিষীরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে— এই শিশুটি বড় হয়ে বিশ্বজয়ী এক মহান যোদ্ধা হবে যার হাতে ঝরবে অসংখ্য মানুষের রক্ত।

শৈশব ও পারিবারিক প্রভাব

তেমুজিনের বাবা ইয়েসুগাই ছিলেন একজন প্রভাবশালী নেতা। তিনি যখন তেমুজিনের মাকে (হোয়েলুন) অন্য এক গোত্র থেকে অপহরণ করে নিয়ে আসেন, তখন থেকেই সেই গোত্রের সাথে তাঁদের শত্রুতা তৈরি হয়। তেমুজিন যখন ৯ বছরের বালক, তখন প্রথা অনুযায়ী তাঁর বিয়ের কথা ঠিক করতে ইয়েসুগাই তাঁকে নিয়ে কঙ্গিরাত গোত্রে যান। সেখানে বোর্তে নামের এক বালিকার সাথে তেমুজিনের বাগদান সম্পন্ন হয়।

কিন্তু ফেরার পথে তেমুজিনের জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে যায়। পথে তাতার গোত্রের লোকেরা ইয়েসুগাইকে মেহমানদারির কথা বলে খাবারে বিষ প্রয়োগ করে। বাড়ি ফেরার পথেই ইয়েসুগাই মৃত্যুবরণ করেন।

৯ বছরের এক বালক এবং তাঁর মা ও ভাই-বোনদের ওপর নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। ইয়েসুগাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর গোত্রের লোকেরা এক অনাথ পরিবারকে খাবার দিতে অস্বীকার করল এবং তেমুজিনদের স্তেপের নির্জনতায় একা ফেলে চলে গেল। তেমুজিনের শৈশব শুরু হলো ঘাস আর ইঁদুর খেয়ে বেঁচে থাকার এক অমানবিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে।

## অন্ধকার শৈশব — নির্বাসন ও বেঁচে থাকার লড়াই

ইয়েসুগাই বাহাদুরের মৃত্যুর পর মঙ্গোল স্তেপের আকাশ তেমুজিনের পরিবারের জন্য এক নিমিষেই কালো হয়ে উঠল। তেমুজিনের বয়স তখন মাত্র নয় বছর। মঙ্গোল প্রথা অনুযায়ী, নেতার মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা শক্তিশালী কাউকে নেতা হিসেবে বেছে নেয়। তেমুজিনের বাবা যে 'কিয়াদ' গোত্রের নেতৃত্ব দিতেন, সেই গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠরা এক অনাথ বালককে নেতা হিসেবে মানতে অস্বীকার করল।

১. গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা ও নির্বাসন

ইয়েসুগাইয়ের রেখে যাওয়া অনুসারীরা তেমুজিনের মা হোয়েলুন এবং তাঁর সন্তানদের ফেলে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। হোয়েলুন ঘোড়ায় চড়ে তাদের থামানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কেউ শোনেনি। তারা বলল, "পুকুরের পানি শুকিয়ে গেছে, পাথর ভেঙে গেছে।" অর্থাৎ ইয়েসুগাই শেষ, তাই তাঁর পরিবারের প্রতি আর কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

পুরো পরিবারকে স্তেপের জনমানবহীন এক মরুপ্রান্তরে নির্বাসিত করা হলো। তাদের সাথে ছিল না কোনো গৃহপালিত পশু, না ছিল কোনো তাবু (ইউর্ট)। আরবের মরুভূমির চেয়েও মঙ্গোলিয়ার শীতকালীন আবহাওয়া ছিল ভয়াবহ নিষ্ঠুর। সেখানে মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেঁচে থাকাটাই ছিল এক অলৌকিক ব্যাপার।

২. দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আদিম সংগ্রাম

অল্পবয়সী তেমুজিন, তাঁর তিন ভাই (কাসার, হাজিউন, তেমুগে), সৎ ভাই (বেগতার ও বেলগুতেই) এবং বোন তেমুলুনকে নিয়ে মা হোয়েলুন শুরু করলেন এক অভাবনীয় লড়াই। যে মা একসময় নেতার পত্নী ছিলেন, তিনি এখন বুনো ফল, শিকড় এবং নদীর ছোট মাছ ধরে সন্তানদের মুখ বাঁচাতে লাগলেন।

- শিকারি জীবন: তেমুজিন ও কাসার শিখলেন কীভাবে তীরে শাঁ শাঁ করে উড়ন্ত পাখি শিকার করতে হয়। অনেক সময় তারা বুনো ইঁদুর (মারমট) ধরে পুড়িয়ে খেতেন।
- মানসিক পরিবর্তন: এই দারিদ্র্য তেমুজিনকে শিখিয়েছিল যে দুনিয়ায় কেউ কারো নয়। মানুষের ওপর বিশ্বাস করার চেয়ে নিজের হাতের তীরের ওপর বিশ্বাস করা অনেক বেশি নিরাপদ।

৩. পারিবারিক সংঘাত ও ভাই হত্যা (একটি ঐতিহাসিক মোড়)

দারিদ্র্যের মধ্যে খাবারের জন্য ভাইদের মধ্যে বিবাদ শুরু হলো। তেমুজিনের সৎ ভাই বেগতার ছিল বয়সে বড় এবং সে তেমুজিনদের শিকার করা মাছ বা পাখি কেড়ে নিত। তেমুজিনের মনে

ভয় জাগল যে বেগতার যদি বড় হয়ে গোত্রের নেতৃত্ব কেড়ে নেয়, তবে তাদের কষ্ট আরও বাড়বে।

একই সাথে বেগতারের আচরণ ছিল উদ্ধত। একদিন তেমুজিন ও তাঁর ভাই কাসার মিলে একটি মাছ ধরেছিলেন, যা বেগতার কেড়ে নেয়। তেমুজিন তাঁর মা'র কাছে বিচার চাইলেন, কিন্তু হোয়েলুন তাদের শান্ত থাকতে বললেন। কিন্তু তেমুজিন শান্ত হলেন না।

তিনি কাসারকে সাথে নিয়ে চুপিচুপি বেগতারকে ঘিরে ফেললেন। বেগতার যখন একটি টিলার ওপর একা বসে ছিলেন, তখন তেমুজিন সামনে থেকে এবং কাসার পেছন থেকে তীর ধনুক তাক করলেন। বেগতার বুঝতে পারলেন তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত। তিনি কেবল অনুরোধ করলেন যেন তাঁর ছোট ভাই বেলগুতেইকে হত্যা না করা হয়। তেমুজিন ও কাসার নির্মমভাবে তাঁদের নিজের ভাইকে তীরে বিদ্ধ করে হত্যা করলেন।

৪. মায়ের ক্রোধ ও তেমুজিনের কঠিন শিক্ষা

রক্তাক্ত হাতে বাড়িতে ফেরার পর মা হোয়েলুন উন্মত্তের মতো চিৎকার করে উঠলেন। তিনি তেমুজিনকে **'খুনী'**, **'হিংস্র জানোয়ার'** বলে গালি দিলেন। তিনি বলেছিলেন, **"**এখন আমাদের কোনো বন্ধু নেই, শুধু নিজের ছায়া ছাড়া। আর সেই অবস্থায় তুমি নিজের ভাইকে মারলে***?"***

মায়ের এই তিরস্কার তেমুজিনকে জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষাটি দিয়েছিল— একতা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে একা লড়লে মঙ্গোলিয়ার এই রক্তপিপাসু স্তেপে টিকে থাকা অসম্ভব। ভাইদের মধ্যে একতা না থাকলে বাইরের শত্রু তাদের শেষ করে দেবে। এই অনুশোচনা আর শিক্ষাই পরবর্তীতে 'মঙ্গোল একতা'র মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

হোয়েলুন উঝিন: এক অপরাজেয় মা

তেমুজিনের জীবনের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন তাঁর মা হোয়েলুন। তেমুজিনের বাবা যখন বিষক্রিয়ায় মারা যান এবং গোত্রের লোকেরা তাঁদের মরুভূমিতে একা ফেলে চলে যায়, তখন হোয়েলুন ভেঙে পড়েননি।

- শিক্ষক হিসেবে: তিনি সন্তানদের শিখিয়েছিলেন কীভাবে বুনো ফল আর শিকড় খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। তিনি তাদের মনে মঙ্গোলিয়ার প্রাচীন ইতিহাস আর বীরত্বের গল্প গেঁথে দিয়েছিলেন।
- একতার মন্ত্র: সেই বিখ্যাত তীরের গল্প—একটি তীর ভাঙা সহজ কিন্তু একগুচ্ছ তীর ভাঙা অসম্ভব—এটি তেমুজিন প্রথম তাঁর মায়ের কাছ থেকেই শিখেছিলেন। হোয়েলুনই ছিলেন সেই শক্তি, যিনি তেমুজিনকে এক অনাথ বালক থেকে এক অপরাজেয় নেতায় রূপান্তর করেছিলেন।

# লোহার খাঁচায় তেমুজিন — বন্দী দশা ও অলৌকিক পলায়ন

বেগতারকে হত্যার পর তেমুজিনের নাম স্তেপের বাতাসে এক অশুভ বার্তা হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে। এই খবর পৌঁছায় তাঁদের শত্রু গোত্র তৈচি উদ-দের কানে। এই সেই গোত্র, যারা তেমুজিনের পরিবারকে অনাহারে ফেলে চলে গিয়েছিল। তারা ভয় পেল যে ইয়েসুগাইয়ের এই ছেলে যদি বেঁচে থাকে, তবে বড় হয়ে সে একদিন ঠিকই প্রতিশোধ নেবে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিল— তেমুজিনকে হয় মারতে হবে, না হয় সারাজীবনের জন্য পঙ্গু করে দিতে হবে।

১. অতর্কিত আক্রমণ ও তেমুজিনের পলায়ন

একদিন তৈচি উদ যোদ্ধারা বিশাল বাহিনী নিয়ে তেমুজিনদের ডেরায় হানা দিল। তেমুজিন তাঁর পরিবারকে রক্ষার জন্য পাহাড়ের গহীন বনে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। টানা নয় দিন তিনি বনের মধ্যে আত্মগোপন করে রইলেন। তাঁর সাথে খাবার ছিল না, ছিল না কোনো পানি। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে তিনি যখন পাহাড় থেকে নামার চেষ্টা করলেন, তখনই শত্রুরা তাঁকে ঘিরে ফেলল।

তৈচি উদ নেতা তারগুতাই তেমুজিনকে দেখে হাসল। সে তাঁকে সাথে সাথে হত্যা না করে এক পৈশাচিক শাস্তি দিল। তেমুজিনের গলায় পরিয়ে দেওয়া হলো একটি ভারী কাঠের ‘কাঙ’ **(Cangue)**। এটি এমন এক জোয়াল, যা হাত ও ঘাড়কে একত্রে আটকে রাখে। এই অবস্থায় একজন মানুষ নিজের হাতে খাবার খেতে পারে না, এমনকি শোয়াটাও হয়ে পড়ে অসম্ভব যন্ত্রণাদায়ক।

২. লোহার খাঁচা ও অপমানের দিনগুলো

তেমুজিনকে তৈচি উদ ডেরায় নিয়ে যাওয়া হলো। প্রতিদিন তাঁকে এক তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে নেওয়া হতো যেন সবাই এই 'অভিশপ্ত' বালককে দেখে উপহাস করতে পারে। তাঁর জীবন তখন হয়ে উঠল পশুর চেয়েও অধম। রাতের পর রাত তিনি ভারী কাঠের জোয়াল ঘাড়ে নিয়ে অপমানে নীল হতেন। কিন্তু তেমুজিন ভেঙে পড়েননি। তিনি শিখছিলেন— শত্রুর শক্তি কতটুকু এবং তাদের দুর্বলতা কোথায়।

এই বন্দী দশায় তেমুজিন একটি চরম শিক্ষা পেলেন। তিনি দেখলেন যে, শত্রুদের মাঝেও কিছু মানুষ থাকে যারা মানবিকতা ভোলেনি। সোরকান শিরা নামক এক দরিদ্র রাখাল তেমুজিনের এই কষ্ট দেখে গোপনে তাঁর তৃষ্ণা মেটাত এবং তাঁকে সাহস জোগাত।

৩. সেই ঐতিহাসিক রাত: অলৌকিক পলায়ন

গ্রীষ্মের এক রাতে তৈচি উদ গোত্রের লোকেরা এক বড় ভোজের আয়োজন করল। প্রচুর মদ্যপান (কুমিস) করার ফলে যোদ্ধারা সবাই যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তেমুজিন বুঝলেন— এটাই সুযোগ।

- আক্রমণ: তেমুজিন তাঁর ঘাড়ের সেই ভারী কাঠের জোয়ালটি দিয়ে পাহারাদারের মাথায় এক প্রচণ্ড আঘাত করলেন। পাহারাদার লুটিয়ে পড়ল।
- নদীতে লুকানো: জোয়ালটি ঘাড়ে থাকা অবস্থাতেই তেমুজিন দৌড়ে অনোন নদীর ধারে গেলেন। হাত বাঁধা থাকায় সাঁতার কাটা অসম্ভব ছিল, তাই তিনি নদীর অগভীর পানির নিচে শরীর ডুবিয়ে দিলেন এবং কেবল নাকটি উপরে রাখলেন।
- সোরকান শিরার সাহায্য: তৈচি উদ যোদ্ধারা মশাল নিয়ে নদীর পাড়ে তেমুজিনকে খুঁজতে শুরু করল। সোরকান শিরা তেমুজিনকে পানির নিচে দেখতে পেলেন। কিন্তু তিনি চিৎকার না দিয়ে বরং যোদ্ধাদের অন্যদিকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তেমুজিনকে কানে কানে বললেন, "তেমুজিন, আজ তোমার ভাগ্য তোমাকে বাঁচালো। পালাও!"

৪. মুক্তি এবং নতুন শপথ

সোরকান শিরার সহায়তায় তেমুজিন তাঁর ঘাড়ের সেই জোয়াল থেকে মুক্তি পেলেন। সোরকান তাঁকে একটি ঘোড়া এবং একটি ধনুক দিলেন। তেমুজিন দ্রুত তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে গেলেন। এই পলায়ন তেমুজিনকে স্তেপে এক অমর খ্যাতি এনে দিল। মানুষ বলাবলি করতে লাগল— যে বালক তৈচি উদ-দের চোখের ধুলো দিয়ে পালাতে পারে, তাকে রক্ষা করছেন স্বয়ং 'তেংরি' (আকাশের দেবতা)।

এই ঘটনার পর তেমুজিনের চোখের দৃষ্টি বদলে গেল। তিনি এখন আর সেই অসহায় বালক নন। তাঁর গলায় তলোয়ারের যে দাগ ছিল, তা সারাজীবন তাঁকে মনে করিয়ে দিত— মঙ্গোলিয়াতে ক্ষমা বলতে কিছু নেই, আছে কেবল শক্তি।

## ভালোবাসা ও অগ্নিপরীক্ষা — বোর্তে অপহরণ ও প্রথম রণহুঙ্কার

তেমুজিন এখন আর সেই বন্দী বালক নন। তাঁর পলায়নের কাহিনী স্তেপের বাতাসে এক বীরের আগমনী বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু স্তেপের জীবন বড় নির্দয়; এখানে আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতেই বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা।

১. দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পুনর্মিলন ও বিবাহ

শৈশবে বাবা ইয়েসুগাই তেমুজিনের বিয়ে ঠিক করেছিলেন কঙ্গিরাত গোত্রের রূপবতী কন্যা বোর্তে-র সাথে। দীর্ঘ বিরহ আর সংগ্রামের পর তেমুজিন তাঁর সেই শৈশবের বাগদত্তার খোঁজে বের হলেন। বোর্তের পিতা 'দেই সেচেন' তেমুজিনকে দেখে অবাক হলেন—ভাবতেও পারেননি সেই অনাথ বালকটি আজও বেঁচে আছে।

বিয়ে সম্পন্ন হলো। মঙ্গোলিয়ার সেই রুক্ষ প্রান্তরে তেমুজিন খুঁজে পেলেন এক শান্তিময় আশ্রয়। বোর্তে কেবল তাঁর স্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন তেমুজিনের সবচেয়ে বড় পরামর্শদাতা। বিয়ের উপহার হিসেবে বোর্তের পরিবার তেমুজিনকে একটি অত্যন্ত দামী 'কৃষ্ণ স্লেট চাদর' **(Black Sable Robe)** উপহার দিল। এটি ছিল তৎকালীন স্তেপে আভিজাত্য ও ক্ষমতার প্রতীক।

২. মৈত্রী ও কূটনীতি: তোঘরিল খানের সাথে সাক্ষাৎ

তেমুজিন জানতেন একা টিকে থাকা সম্ভব নয়। তিনি তাঁর বাবার পুরোনো মিত্র এবং মঙ্গোলিয়ার অন্যতম শক্তিশালী গোত্র 'কেরাইত'-এর নেতা তোঘরিল খান (যিনি ওং খান নামে পরিচিত ছিলেন)-এর কাছে গেলেন। তেমুজিন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সেই দামি কৃষ্ণ চাদরটি তোঘরিল খানকে উপহার দিলেন। তোঘরিল খুশি হয়ে তেমুজিনকে নিজের ছেলের মর্যাদা দিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন— "আমি তোমার হারানো মানুষের মিলন মেলাব, তোমার বিচ্ছিন্ন গোত্রকে আবার এক করে দেব।"

৩. সেই অভিশপ্ত রাত: মেরকিটদের হানা

তেমুজিন যখন শান্তিতে জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখছিলেন, তখনই অতীতের এক কালো ছায়া তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। তেমুজিনের মা হোয়েলুনকে তাঁর বাবা ইয়েসুগাই ছিনিয়ে এনেছিলেন মেরকিট গোত্রের এক নেতার কাছ থেকে। মেরকিটরা সেই অপমানের প্রতিশোধ নেয়নি।

এক গভীর রাতে, তেমুজিনের ডেরায় কয়েকশ মেরকিট ঘোড়সওয়ার অতর্কিত আক্রমণ করল। তেমুজিন তাঁর মা ও ভাইদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যেতে পারলেও, বিশৃঙ্খলার মাঝে বোর্তে পিছিয়ে পড়লেন। মেরকিটরা বোর্তেকে বন্দী করে নিয়ে গেল। তেমুজিন পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে দেখলেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে শত্রুরা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

৪. তেমুজিনের হাহাকার ও শপথ

বোর্তেকে হারানোর পর তেমুজিন তিন দিন তিন রাত পাহাড়ের ওপর উপাসনা করলেন। তিনি তাঁর কোমরবন্ধ খুলে ঘাড়ে রাখলেন এবং আকাশের দেবতা 'তেংরি'র কাছে শক্তি চাইলেন। মঙ্গোলিয়ার ইতিহাসে এটিই ছিল তেমুজিনের প্রথম বড় যুদ্ধযাত্রা। তিনি তাঁর রক্তের ভাই (আন্দা) জামুকা এবং তোঘরিল খানের সাহায্য চাইলেন।

৫. উদ্ধার অভিযান: প্রথম বিজয়

তেমুজিন, জামুকা এবং তোঘরিল খানের সম্মিলিত বিশাল বাহিনী মেরকিটদের ডেরায় অতর্কিত আক্রমণ চালাল। সেটি ছিল এক রক্তক্ষয়ী রাত। তেমুজিন পাগলের মতো প্রতিটি তাঁবুতে বোর্তেকে খুঁজছিলেন। যুদ্ধের চিৎকারের মাঝে তেমুজিন বারবার ডাকছিলেন—"বোর্তে! বোর্তে!" অবশেষে বোর্তে যখন তেমুজিনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, তিনি দৌড়ে এসে তেমুজিনের ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরলেন। চাঁদের আলোয় সেই পুনর্মিলন ছিল অত্যন্ত নাটকীয়। তেমুজিন বোর্তেকে উদ্ধার করলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সামনে তখন এক বড় প্রশ্ন। বোর্তে যখন উদ্ধার হলেন, তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন।

৬. তেমুজিনের মহত্ত্ব ও জচির জন্ম

বোর্তের গর্ভে থাকা সন্তানটি তেমুজিনের নাকি মেরকিট নেতার—এই নিয়ে স্তেপে গুঞ্জন উঠল। কিন্তু তেমুজিন প্রমাণ করলেন কেন তিনি অন্য সবার চেয়ে আলাদা। তিনি ঘোষণা করলেন—বোর্তে নির্দোষ এবং এই সন্তান তাঁরই। তিনি বড় ছেলের নাম রাখলেন 'জচি' **(Jochi)**, মঙ্গোল ভাষায় যার অর্থ 'অতিথি'। এই উদারতা তেমুজিনকে একজন মহান নেতায় পরিণত করল।

## বন্ধু থেকে শত্রু — রক্তবন্ধুর বিচ্ছেদ ও ক্ষমতার লড়াই

বোর্তেকে উদ্ধারের পর তেমুজিন এবং তাঁর রক্তবন্ধু (আন্দা) জামুকা এক বছর একই সাথে জীবন যাপন করেন। তারা একই কম্বল শেয়ার করতেন এবং শপথ করেছিলেন যে তারা চিরকাল এক হয়ে লড়বেন। কিন্তু মঙ্গোলিয়ার আকাশ কখনো দুজন সূর্যকে একসাথে জায়গা দেয় না। জামুকা ছিলেন আভিজাত্যের প্রতীক, আর তেমুজিন ছিলেন সাধারণ মানুষের নেতা। এই মতাদর্শগত পার্থক্যই তাঁদের একসময় চরম শত্রুতে পরিণত করে।

১. 'আন্দা' বা রক্তবন্ধুর বিচ্ছেদ

মঙ্গোল প্রথা অনুযায়ী, জামুকা ছিলেন উচ্চবংশীয় গোত্রীয় নেতা। তিনি বিশ্বাস করতেন কেবল আভিজাত্য বা রক্তের সম্পর্ক থাকলেই কেউ নেতা হতে পারে। অন্যদিকে তেমুজিন বিশ্বাস করতেন 'যোগ্যতা' **(Meritocracy)**-তে। তেমুজিন তাঁর বাহিনীতে সাধারণ রাখালদেরও উচ্চপদ দিতেন যদি তারা সাহসী হতো।

একদিন যাযাবরদের স্থান পরিবর্তনের সময় জামুকা তেমুজিনকে একটি রহস্যময় কথা বললেন: "তেমুজিন, যারা পাহাড়ে তাঁবু খাটাবে তারা ভালো ঘোড়া পাবে, আর যারা নদীর ধারে থাকবে তারা ভালো মেষ পাবে।" বোর্তে এই কথার অর্থ বুঝতে পারলেন—জামুকা পরোক্ষভাবে

তেমুজিনকে আলাদা হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। সেই রাতেই তেমুজিন তাঁর অনুসারীদের নিয়ে জামুকার ডেরা ত্যাগ করলেন। এভাবেই ভাঙল দুই বন্ধুর ঐতিহাসিক মৈত্রী।

২. প্রথম গৃহযুদ্ধ: দলান বালজুত-এর যুদ্ধ

বিচ্ছেদের পর তেমুজিনকে তাঁর অনুসারীরা 'খান' হিসেবে ঘোষণা করে। এতে জামুকা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ১১৯০ সালে জামুকা ৩০,০০০ যোদ্ধা নিয়ে তেমুজিনের ওপর আক্রমণ করেন। ইতিহাসে এটি 'দলান বালজুত-এর যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

- পরাজয়: এই যুদ্ধে তেমুজিন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন।
- জামুকার নিষ্ঠুরতা: যুদ্ধ জয়ের পর জামুকা তেমুজিনের সেনাপতিদের জীবন্ত অবস্থায় ৭০টি বড় কড়াইয়ের ফুটন্ত পানিতে সেদ্ধ করে মারেন। এই চরম নিষ্ঠুরতা তেমুজিনের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়, কিন্তু সাধারণ মঙ্গোলরা জামুকার ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে তেমুজিনের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে।

৩. তেমুজিনের পুনরুত্থান ও সংস্কার

পরাজয়ের পর তেমুজিন ১০ বছর নেপথ্যে থেকে নিজেকে শক্তিশালী করেন। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীতে এমন কিছু সংস্কার আনেন যা আগে কেউ কল্পনা করেনি:

- দশমিক পদ্ধতি (Decimal System): তিনি সেনাবাহিনীকে ১০, ১০০, ১০০০ এবং ১০,০০০ (তুমান) ভাগে ভাগ করেন।
- কঠোর শৃঙ্খলা: যুদ্ধের ময়দানে লুটপাটের চেয়ে বিজয়কে বেশি গুরুত্ব দেন। তিনি ঘোষণা করেন, যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে কেউ লুণ্ঠন করতে পারবে না এবং লুণ্ঠিত মালামাল সবার মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে।

৪. তাতার গোত্রের পতন

১২০২ সালে তেমুজিন তাঁর বাবার হত্যাকারী তাতার গোত্রকে আক্রমণ করেন। তিনি তাতারদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। যুদ্ধের পর তিনি এক কঠোর সিদ্ধান্ত নেন—যেসব তাতার পুরুষ উচ্চতায় একটি গরুর গাড়ির চাকার (Axle) চেয়ে বেশি, তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে। এটি ছিল তাঁর শত্রুদের প্রতি এক চরম হুঁশিয়ারি।

৫. জামুকার শেষ পরিণতি

পরপর কয়েকটি যুদ্ধের পর জামুকা একসময় নিঃস্ব হয়ে পড়েন। তাঁর নিজের অনুসারীরাই তাঁকে ধোঁকা দিয়ে তেমুজিনের কাছে ধরে নিয়ে আসে। তেমুজিন তাঁর পুরোনো বন্ধুকে দেখে আবেগাপ্লুত হয়েছিলেন। তিনি জামুকাকে আবার একসাথে কাজ করার প্রস্তাব দেন।

কিন্তু জামুকা ছিলেন একজন গর্বিত মঙ্গোল। তিনি বললেন, "বন্ধু তেমুজিন, মঙ্গোলিয়ার আকাশে দুটি সূর্য থাকতে পারে না। আমাকে এমনভাবে মৃত্যুদণ্ড দাও যেন আমার রক্ত মাটিতে না পড়ে।" মঙ্গোলীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, রাজপরিবারের সদস্যদের রক্ত মাটিতে পড়া অমঙ্গলজনক। তেমুজিন তাঁর প্রিয় বন্ধুর শেষ ইচ্ছা পূরণ করলেন। জামুকার পিঠের হাড় ভেঙে তাঁকে রক্তপাতহীনভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। তেমুজিন হারালেন তাঁর শৈশবের শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে, কিন্তু লাভ করলেন সমগ্র মঙ্গোলিয়ার অবিসংবাদিত নেতৃত্ব।

## মঙ্গোলিয়ার ঐক্য ও 'চেঙ্গিস খান' উপাধি লাভ

১২০৬ সাল। তেমুজিনের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছর। গত কয়েক দশকের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ, প্রিয়জন হারানো আর বিশ্বাসঘাতকতার পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি আজ এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছেন, যেখানে তাঁর অবাধ্য হওয়ার সাহস কারও নেই।

১. কুরুলতাই: মঙ্গোলিয়ার মহাসভা

অনোন নদীর তীরে মঙ্গোলিয়ার ইতিহাসে সর্ববৃহৎ এক সভার আয়োজন করা হলো। একে বলা হয় ‘কুরুলতাই’। স্তেপ অঞ্চলের প্রতিটি বড়-ছোট গোত্রের প্রতিনিধিরা সেখানে সমবেত হলেন। হাজার হাজার সাদা তাঁবুতে ছেয়ে গেল নদীর দুই কুল। মঙ্গোলিয়ার নীল আকাশের নিচে সাদা নয়টি লেজের এক বিশাল পতাকা উত্তোলন করা হলো, যা ছিল একতার প্রতীক।

২. 'চেঙ্গিস খান' উপাধি লাভ

এই মহাসভায় তেমুজিনকে সর্বসম্মতিক্রমে সকল মঙ্গোলদের নেতা হিসেবে ঘোষণা করা হলো। শামান বা ধর্মীয় গুরুরা ঘোষণা করলেন যে, আকাশের দেবতা 'তেংরি' তেমুজিনকে পুরো পৃথিবী শাসনের অধিকার দিয়েছেন।

সেদিন তাঁকে 'চেঙ্গিস খান' **(Genghis Khan)** উপাধি দেওয়া হয়। এর অর্থ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে, তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অর্থ হলো— "বিশ্বের অধিপতি" বা "মহাসমুদ্রের ন্যায় বিশাল নেতা"। সেই অনাথ বালক তেমুজিন আজ থেকে বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় 'চেঙ্গিস খান' হিসেবে নাম লেখালেন।

৩. ইয়াসা: কঠোর শাসনতন্ত্রের শুরু

চেঙ্গিস খান জানতেন, কেবল যুদ্ধ করে সাম্রাজ্য টেকানো যায় না। তাই তিনি প্রবর্তন করলেন তাঁর বিখ্যাত আইন ‘ইয়াসা’।

- শৃঙ্খলা: চুরি, ব্যভিচার এবং বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি ছিল সরাসরি মৃত্যু।
- একতা: এক মঙ্গোল অন্য মঙ্গোলকে দাস হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না।
- ধর্মীয় স্বাধীনতা: চেঙ্গিস খান নিজে শামান ধর্মের অনুসারী হলেও তাঁর সাম্রাজ্যে বৌদ্ধ, মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের যার যার ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। এটি ছিল সে আমলের জন্য এক বৈপ্লবিক চিন্তা।

৪. আধুনিক সেনাবাহিনী ও নতুন পরিচিতি

চেঙ্গিস খান গোত্রীয় ভেদাভেদ চিরতরে মুছে দিলেন। এখন আর কেউ 'তাতার' বা 'মেরকিট' নয়, সবাই এখন এক পরিচয়— মঙ্গোল। তিনি এক দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক তৈরি করলেন, যার মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে খবর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যেত।

বোর্তে উঝিন: চেঙ্গিস খানের ছায়া এবং বিবেক

চেঙ্গিস খানের প্রথম স্ত্রী বোর্তে কেবল তাঁর জীবনসঙ্গিনী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সম্রাটের প্রধান রাজনৈতিক উপদেষ্টা।

- পরামর্শদাতা: যখন তেমুজিন তাঁর রক্তবন্ধু জামুকার সাথে থাকবেন কি না তা নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন, বোর্তেই প্রথম জামুকার বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তেমুজিনকে আলাদা হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।
- ক্ষমতা: চেঙ্গিস খান যখন বিশ্বজয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তখন মঙ্গোলিয়ার মূল ভূখণ্ড পরিচালনার অদৃশ্য চাবিকাঠি থাকত বোর্তের হাতে। সম্রাট তাঁর যেকোনো বড় সামরিক অভিযানের আগে বোর্তের সাথে একান্তে আলোচনা করতেন। বোর্তে ছিলেন সেই শান্ত সমুদ্র, যা চেঙ্গিস খানের ভেতরের আগ্নেয়গিরিকে নিয়ন্ত্রণ করত।

## অপরাজেয় বাহিনী — সামরিক কৌশল ও সংস্কার

চেঙ্গিস খান যখন মঙ্গোলিয়ার একক অধিপতি হলেন, তখন তাঁর সামনে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মঙ্গোলরা ছিল সংখ্যায় কম, কিন্তু তাদের শত্রু—যেমন চীনের জিন রাজবংশ বা পারস্যের খ্‌ওয়ারিজম সাম্রাজ্য—ছিল লাখে লাখে সৈন্যে সমৃদ্ধ। চেঙ্গিস খান জানতেন, কেবল

তলোয়ার দিয়ে এই বিশ্বজয় সম্ভব নয়; এর জন্য চাই এমন এক সামরিক যন্ত্র যা আগে কেউ দেখেনি।

১. দশমিক পদ্ধতিতে বিন্যাস ও লৌহকঠিন শৃঙ্খলা

চেঙ্গিস খান তাঁর সেনাবাহিনীকে 'দশমিক' পদ্ধতিতে ভাগ করলেন। ১০ জন সৈন্য নিয়ে একটি 'আরবান', ১০টি আরবান নিয়ে একটি 'জুউন' (১০০ জন), ১০টি জুউন নিয়ে একটি 'মিঙ্গান' (১০০০ জন) এবং ১০টি মিঙ্গান নিয়ে গঠিত হতো একটি 'তুমান' (১০,০০০ জন)।

---

সেদিন স্তেপের প্রান্তরে যখন হাজার হাজার ঘোড়সওয়ার তাদের তুমান অনুযায়ী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াত, তখন দূর থেকে মনে হতো দিগন্তজুড়ে এক কালো মেঘ ধেয়ে আসছে। চেঙ্গিস খান আইন করে দিলেন যে, যদি কোনো আরবানের একজন সৈন্য পালিয়ে যায়, তবে বাকি ৯ জনকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এই আইনের ফলে মঙ্গোল বাহিনীর মধ্যে এমন এক ভ্রাতৃত্ব ও একতা তৈরি হলো, যেখানে একে অপরের জন্য প্রাণ দেওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক। যুদ্ধের ময়দানে তাদের নীরবতা ছিল শ্মশানের মতো ভয়াবহ, আর তাদের আক্রমণ ছিল বজ্রপাতের মতো দ্রুত।

২. আলোর চেয়েও দ্রুত: অশ্বারোহী বাহিনী

মঙ্গোল বাহিনীর প্রধান শক্তি ছিল তাদের ঘোড়া। একজন মঙ্গোল যোদ্ধার সাথে সব সময় ৩ থেকে ৪টি ঘোড়া থাকত। তারা এক ঘোড়া ক্লান্ত হলে চলন্ত অবস্থায় অন্য ঘোড়ায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ত। ফলে তারা দিনে ১০০ মাইলের বেশি পথ পাড়ি দিতে পারত, যা তৎকালীন বিশ্বের অন্য কোনো সেনাবাহিনীর পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল।

বাতাসের গতিকে হার মানিয়ে যখন হাজার হাজার মঙ্গোল ঘোড়া মরুভূমি বা পাহাড় পাড়ি দিত, তখন মাটির কম্পন কয়েক মাইল দূর থেকে টের পাওয়া যেত। তাদের ঘোড়াগুলো ছিল ছোট কিন্তু অত্যন্ত সহনশীল। যুদ্ধের সময় এই ঘোড়াগুলোই হয়ে উঠত যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ সঙ্গী। তেমুজিন শিখিয়েছিলেন, কীভাবে ঘোড়ার পিঠে বসেই পেছনের দিকে ঘুরে নিখুঁতভাবে তীর ছুড়তে হয়—যাকে বলা হতো ‘পার্থিয়ান শট’।

৩. মঙ্গোল ধনুক: একটি মারণাস্ত্র

মঙ্গোল যোদ্ধাদের ধনুক ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এটি তৈরিতে ব্যবহার করা হতো হাড়, শিং এবং কাঠ। এর পাল্লা ছিল প্রায় ৩৫০ গজ। মঙ্গোলরা যখন তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করত, তখন আকাশ অন্ধকার হয়ে যেত।

---

কল্পনা করুন, হাজার হাজার তীর একসাথে যখন শত্রুর ওপর আছড়ে পড়ত, তখন মনে হতো যেন আকাশ থেকে মৃত্যুর পরোয়ানা নেমে আসছে। তীরের অগ্রভাগে লাগানো সঙ্কেতবাহী শিস দেওয়ার ব্যবস্থা **(Whistling Arrows)** যুদ্ধের ময়দানে আদেশ আদান-প্রদানের কাজে ব্যবহৃত হতো। সেই শিসের শব্দ শুনলেই শত্রুদের বুকের ভেতর কাঁপন ধরে যেত, কারণ তারা জানত—এই শব্দের পরপরই ধেয়ে আসবে নিশ্চিত মৃত্যু।

৪. মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ও গোয়েন্দা জাল

চেঙ্গিস খান যুদ্ধের আগে শত্রুর এলাকায় গুপ্তচর পাঠাতেন। তারা বাজারে গুজব ছড়িয়ে দিত যে, মঙ্গোলরা মানুষ নয়, তারা হলো নরকের শয়তান এবং তারা মানুষের মাংস খায়। এই ভয়ে অনেক বড় বড় দুর্গ যুদ্ধের আগেই আত্মসমর্পণ করত।

তিনি যখন কোনো শহর আক্রমণ করতে যেতেন, তখন সূর্যের বিপরীতে অবস্থান নিতেন যেন শত্রুরা রোদের কারণে মঙ্গোলদের সংখ্যা ঠিকমতো বুঝতে না পারে। অনেক সময় তিনি ঘোড়ার পিঠে পুতুল বসিয়ে রাখতেন যেন দূর থেকে মঙ্গোল বাহিনীকে বিশাল মনে হয়। যুদ্ধের ময়দানে চেঙ্গিস খানের এই মস্তিষ্কই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

## মহাপ্রাচীর লঙ্ঘন ও ড্রাগনের পতন — চীন অভিযান

মঙ্গোলিয়া এখন একতাবদ্ধ, কিন্তু চেঙ্গিস খান জানতেন স্তেপের বাইরে এক বিশাল সম্পদশালী পৃথিবী রয়েছে। তাঁর নজর পড়ল দক্ষিণ-পূর্বে—চীনের জিন রাজবংশের দিকে। তখন চীনের কাছে ছিল বিশাল দুর্গ, উন্নত প্রযুক্তি আর লাখ লাখ সৈন্য। মঙ্গোলরা ছিল তাদের কাছে কেবল 'বর্বর যাযাবর'। কিন্তু এই যাযাবররাই যে একদিন চীনের হাজার বছরের অহংকার চূর্ণ করে দেবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

১. অপমানের প্রতিশোধ ও যুদ্ধের ঘোষণা

জিন রাজবংশের নতুন সম্রাট যখন সিংহাসনে বসলেন, তিনি চেঙ্গিস খানের কাছে বশ্যতা স্বীকারের দাবি জানালেন। চেঙ্গিস খান দূতের মুখে এই খবর শুনে থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন— *"আমি ভেবেছিলাম চীনের সম্রাট আকাশের কোনো সন্তান, কিন্তু সে তো আসলে আমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ!"* এই ছিল যুদ্ধের প্রকাশ্য ঘোষণা।

১.৫ লক্ষ শব্দের বর্ণনায় এই মুহূর্তটি অত্যন্ত নাটকীয়। চেঙ্গিস খান তাঁর সাদা নয়-লেজের পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের দেবতা তেংরির কাছে প্রার্থনা করলেন। তাঁর চোখে তখন কেবল বিজয়ের স্বপ্ন নয়, বরং শত বছরের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার নেশা। তিনি তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন চীনের দিকে অগ্রসর হতে।

২. মহাপ্রাচীরের বাধা ও মঙ্গোল কৌশল

চীনের মহাপ্রাচীর ছিল তৎকালীন বিশ্বের বিস্ময়। বিশাল উঁচু পাথরের দেয়াল, যা ভেদ করা কোনো বাহিনীর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু চেঙ্গিস খান দেয়াল ভাঙার চেষ্টা করলেন না; তিনি করলেন বুদ্ধির ব্যবহার। তিনি এমন সব গিরিপথ এবং পাহাড়ি রাস্তা খুঁজে বের করলেন যা চীনারা অরক্ষিত রেখেছিল।

**[Image: Mongol cavalry bypassing the Great Wall through mountain passes]**

কল্পনা করুন, হাজার হাজার মঙ্গোল ঘোড়সওয়ার যখন পাহাড়ি কুয়াশা ভেদ করে চীনের সমতলে নামছিল, তখন চীনা প্রহরীরা তাদের দেখে শিউরে উঠেছিল। তাদের মনে হয়েছিল, মহাপ্রাচীর যাকে আটকাতে পারেনি, তাকে মানুষ নয়—নিশ্চয়ই কোনো অশুভ আত্মা। মঙ্গোলরা ঝড়ের গতিতে চীনের গ্রামগুলোতে হানা দিল এবং সম্পদ দখল করতে শুরু করল।

৩. বেইজিং অবরোধ: ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই

১২১৪ সালে চেঙ্গিস খান চীনের রাজধানী বেইজিং (তৎকালীন ঝংডু) অবরোধ করেন। বেইজিংয়ের দেয়াল ছিল বিশাল এবং অভেদ্য। মঙ্গোলরা তখন পর্যন্ত দুর্গ ভাঙার কারিগরি জানত না। তাই চেঙ্গিস খান এক নতুন কৌশল নিলেন— 'অবরোধ'। তিনি শহরের চারপাশ এমনভাবে ঘিরে রাখলেন যেন এক দানা খাবারও ভেতরে ঢুকতে না পারে।

শহরের ভেতরে দেখা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ইতিহাসের পাতায় বর্ণিত আছে, ক্ষুধার জ্বালায় বেইজিংয়ের মানুষ তখন নিজেদের মৃত আত্মীয়দের মাংস পর্যন্ত খেতে শুরু করেছিল। মঙ্গোলরা দেয়ালের বাইরে বসে তাবু গেঁড়ে অপেক্ষা করছিল। চেঙ্গিস খান জানতেন, তলোয়ারের চেয়ে ক্ষুধা অনেক বড় শক্তিশালী শত্রু।

৪. ড্রাগনের পতন ও বিপুল সম্পদ লাভ

অবশেষে বেইজিং আত্মসমর্পণ করল। মঙ্গোল বাহিনী যখন শহরের ভেতরে প্রবেশ করল, তারা যা দেখল তা তাদের কল্পনাকেও হার মানায়। সোনার সিংহাসন, রেশমি কাপড় আর পাহাড়সম ধনরত্ন। চেঙ্গিস খান তাঁর যোদ্ধাদের অনুমতি দিলেন লুণ্ঠন করার। বেইজিংয়ের রাস্তাগুলো রক্তের নদীতে পরিণত হলো। কিন্তু চেঙ্গিস খান কেবল সম্পদ নিলেন না, তিনি তুলে নিলেন চীনের সেই সব ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানীদের, যারা জানত কীভাবে কামাণ আর পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র তৈরি করতে হয়। এই মেধাই পরবর্তীতে তাঁকে অপরাজেয় করে তুলেছিল।

# পশ্চিমমুখী অভিযান — কারা-খিতাই ও কুচলুকের পতন

চীনের জিন রাজবংশকে পরাজিত করার পর চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্য এখন বিশাল, কিন্তু তাঁর পশ্চিমে ছিল 'কারা-খিতাই' সাম্রাজ্য। এই অঞ্চলটি ছিল বর্তমান কাজাখস্তান ও কিরগিজস্তানের অংশ। এখানকার শাসক ছিলেন কুচলুক, যিনি ছিলেন চেঙ্গিস খানের পুরনো শত্রু নাইমান গোত্রের নেতা। এই কুচলুক কেবল রাজনৈতিক শত্রু ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন অত্যাচারী শাসক, যিনি ওই অঞ্চলের মুসলিম প্রজাদের ওপর ধর্মীয় নিপীড়ন চালাতেন।

১. কুচলুকের অত্যাচার ও চেঙ্গিস খানের বুদ্ধিমত্তা

কুচলুক ওই অঞ্চলের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তিনি মানুষকে বাধ্য করতেন তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করতে। চেঙ্গিস খান যখন এটি জানলেন, তিনি একে একটি রাজনৈতিক সুযোগ হিসেবে দেখলেন। তিনি তাঁর সেনাপতি জেবে-কে (যাকে 'তীর' বলা হতো) মাত্র ২০,০০০ সৈন্য দিয়ে পাঠালেন। জেবে ছিলেন চেঙ্গিস খানের সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং মেধাবী সেনাপতিদের একজন।

২. ধর্মীয় স্বাধীনতা: যুদ্ধের নতুন হাতিয়ার

জেবে যখন কারা-খিতাইয়ে প্রবেশ করলেন, তিনি কোনো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন না। বরং তিনি ঘোষণা করলেন— "যে যার ধর্ম পালন করতে পারবে, চেঙ্গিস খানের শাসনে সবার ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে।" এই একটি ঘোষণা পুরো এলাকার মানুষকে কুচলুকের বিরুদ্ধে এবং মঙ্গোলদের পক্ষে নিয়ে এল। সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় শহরের ফটক খুলে দিল।

১.৫ লক্ষ শব্দের বর্ণনায় এই মুহূর্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি প্রমাণ করে যে চেঙ্গিস খান কেবল গায়ের জোরে নয়, বরং মানুষের মন জয় করে বা রাজনৈতিক কূটনীতি দিয়েও সাম্রাজ্য জয় করতে জানতেন। কুচলুক তাঁর নিজের প্রজাদের কাছ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন এবং প্রাণভয়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেলেন।

৩. কুচলুকের শেষ পরিণতি

জেবে এবং তাঁর বাহিনী কুচলুককে তাড়া করে পামির মালভূমির দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে কুচলুক ধরা পড়েন এবং তাঁর শিরচ্ছেদ করা হয়। এর মাধ্যমে কারা-খিতাই সাম্রাজ্য পুরোপুরি মঙ্গোলদের অধীনে চলে আসে। এই বিজয়ের ফলে মঙ্গোল সাম্রাজ্যের সীমানা এখন সরাসরি স্পর্শ করল মুসলিম বিশ্বের মহান 'খ্‌ওয়ারজম' **(Khwarazmian)** সাম্রাজ্যের সীমান্তে।

৪. বাণিজ্যের স্বপ্ন ও সিল্ক রোড

কারা-খিতাই জয়ের পর চেঙ্গিস খান ঐতিহাসিক 'সিল্ক রোড' বা রেশম পথের নিয়ন্ত্রণ পেয়ে গেলেন। তিনি চাইলেন যুদ্ধের বদলে ব্যবসা করতে। তিনি খوارজম সাম্রাজ্যের সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদের কাছে এক বন্ধুত্বের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন— "আমি আপনাকে আমার ছেলের মতো মনে করি। আসুন, আমরা একে অপরের সাথে বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করি।" কিন্তু ইতিহাস এই শান্তি প্রস্তাবকে গ্রহণ করেনি, যা জন্ম দিয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস যুদ্ধের।

## প্রলয় উল্লাস — খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পতন ও রক্তের প্রতিশোধ

চেঙ্গিস খান আসলে পশ্চিমের সাথে যুদ্ধ করতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন বাণিজ্য। কিন্তু নিয়তি তাঁর তলোয়ারকে এক চরম পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করাল। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য ছিল খাওয়ারিজম **(Khwarazmian Empire)**, যার সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন মুহাম্মদ। এই সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল সমরকন্দ, বুখারা এবং গজনীর মতো বিখ্যাত সব শহর।

১. ওটরার ট্র্যাজেডি ও যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

১২১৮ সালে চেঙ্গিস খান প্রায় ৪৫০ জন মুসলিম বণিকের একটি বিশাল কাফেলা পাঠান খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ওটরার **(Otrar)** শহরে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সুলতানের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা। কিন্তু ওটরারের গভর্নর ইনালচুক **(Inalchuq)** লোভের বশবর্তী হয়ে ওই বণিকদের ‘গুপ্তচর’ অপবাদ দিয়ে সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করেন এবং তাদের মালামাল লুট করেন।

খবরটি শুনে চেঙ্গিস খান স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ধরে সুলতানের কাছে তিনজন দূত পাঠান এবং গভর্নর ইনালচুককে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান। কিন্তু সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ এক চরম ঔদ্ধত্য দেখালেন—তিনি একজন দূতকে হত্যা করলেন এবং বাকি দুজনের দাড়ি পুড়িয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন।

১.৫ লক্ষ শব্দের বর্ণনায় এই মুহূর্তটি হবে অত্যন্ত গম্ভীর। যখন সেই অপমানিত দূতরা মঙ্গোলিয়া ফিরে এল, চেঙ্গিস খান ক্রোধে ফেটে পড়লেন না, বরং তিনি শান্ত হয়ে একাকী পাহাড়ে চলে গেলেন। তিন দিন তিনি প্রার্থনা করলেন এবং তারপর নেমে এসে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি করলেন— "আমি ছিলাম না, তেংরি তোমাদের ওপর আজাব পাঠিয়েছেন। আমিই সেই আজাব।"

২. মরুভূমির মধ্য দিয়ে মৃত্যুদূতের আগমন

সুলতান ভেবেছিলেন মঙ্গোলরা সাধারণ রাস্তা দিয়ে আসবে। কিন্তু চেঙ্গিস খান এমন এক অসাধ্য সাধন করলেন যা কেউ কল্পনাও করেনি। তিনি তাঁর বিশাল বাহিনীকে নিয়ে পাড়ি দিলেন **'কিজিল কুম' (Kyzyl Kum)** নামক এক বিশাল মরুভূমি, যা আগে কেউ পার হতে পারেনি।

মঙ্গোলরা হঠাৎ করেই খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পেছনে উদয় হলো। সুলতান তখন অপ্রস্তুত। মঙ্গোল বাহিনীর ঘোড়ার খুরের নিচে বুখারা আর সমরকন্দের মাটি কাঁপতে শুরু করল।

৩. বুখারা ও সমরকন্দের পতন

১২২০ সালে চেঙ্গিস খান বুখারায় প্রবেশ করেন। তিনি শহরের প্রধান মসজিদে (মসজিদে জামে) দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে, সুলতানের পাপের কারণেই আজ মঙ্গোলরা এখানে উপস্থিত। মঙ্গোলরা একের পর এক শহর দখল করতে লাগল। সমরকন্দ, যা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র, তা ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হলো।

সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ তাঁর নিজের সাম্রাজ্য ছেড়ে ক্যাস্পিয়ান সাগরের এক দ্বীপে পালিয়ে গেলেন এবং সেখানে নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ছেলে জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ বীরত্বের সাথে লড়াই করলেও মঙ্গোল শক্তির সামনে টিকতে পারেননি।

৪. ওটরারের সেই প্রতিশোধ

যে গভর্নর ইনালচুক মঙ্গোল বণিকদের হত্যা করেছিলেন, তাকে বন্দী করা হলো। চেঙ্গিস খান তাঁর জন্য এক ভয়ানক শাস্তি নির্ধারণ করলেন। কথিত আছে, তাঁর চোখ ও কানে গলিত রুপা ঢেলে দেওয়া হয়েছিল, যেন তাঁর লোভের চরম মূল্য তিনি পান। এটি ছিল চেঙ্গিস খানের সেই কঠোর বার্তা— "আমার দূতের গায়ে হাত দিলে পুরো পৃথিবী জ্বালিয়ে দেব।"

## ইয়াসা ও শৃঙ্খলা — এক অপরাজেয় সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড

চেঙ্গিস খান জানতেন যে, তলোয়ার দিয়ে রাজ্য জয় করা সহজ, কিন্তু আইন ছাড়া সেই রাজ্য ধরে রাখা অসম্ভব। মঙ্গোলরা আগে ছিল যাযাবর, যাদের কোনো লিখিত আইন ছিল না। চেঙ্গিস খান সেই বিশৃঙ্খলা দূর করতে প্রবর্তন করলেন তাঁর বিখ্যাত আইন সংহতি— 'ইয়াসা' **(Yassa)।**

'কন্যা কূটনীতি' **(Daughter Diplomacy)**

চেঙ্গিস খানের কন্যারা—আলানকুয়া, আলখাই এবং অন্যরা—ছিলেন তাঁর সাম্রাজ্যের জীবন্ত প্রাচীর। চেঙ্গিস খান অত্যন্ত সুকৌশলে তাঁর কন্যাদের প্রতিবেশী সিল্ক রোডের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের রাজাদের সাথে বিয়ে দিতেন।

- শর্ত: বিয়ের আগে সেই রাজাকে তাঁর অন্য সব স্ত্রী ত্যাগ করতে হতো এবং মঙ্গোল বাহিনীর হয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে হতো।
- শাসক কন্যা: যখন জামাতারা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকত বা মারা যেত, তখন চেঙ্গিস খানের কন্যারা সেই রাজ্যগুলোর সিংহাসনে বসতেন। এর ফলে মঙ্গোলিয়ার চারপাশে তাঁর নিজের মেয়েদের শাসিত একটি 'সুরক্ষা বলয়' তৈরি হয়েছিল। বলা হয়, চেঙ্গিস খানের কন্যারা না থাকলে মঙ্গোল সাম্রাজ্য এত দ্রুত বিস্তার লাভ করতে পারত না।

১. ইয়াসা: এক মহাজাগতিক শাসনতন্ত্র

ইয়াসা কেবল কিছু নিয়মের সমষ্টি ছিল না, এটি ছিল মঙ্গোলদের জীবনবিধান। চেঙ্গিস খান আদেশ দিয়েছিলেন এই আইনগুলো যেন নীল পাথরে খোদাই করা হয় এবং রাজকীয় আর্কাইভে গোপন রাখা হয়।

- মৃত্যুদণ্ড: বিশ্বাসঘাতকতা, চুরি, ব্যভিচার এবং অনর্থক পানি দূষিত করার শাস্তি ছিল সরাসরি মৃত্যু।
- সামাজিক একতা: এক মঙ্গোল কখনো অন্য মঙ্গোলকে দাসে পরিণত করতে পারবে না। এটি ছিল তাঁর গোত্রীয় কোন্দল থামানোর মূল মন্ত্র।

২. ধর্মীয় স্বাধীনতা ও পরমতসহিষ্ণুতা

তৎকালীন বিশ্বে যখন ধর্মের নামে রক্তগঙ্গা বইত, তখন চেঙ্গিস খান ছিলেন বিস্ময়করভাবে উদার। ইয়াসা আইনের অধীনে মঙ্গোল সাম্রাজ্যে যে কেউ তাঁর নিজের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা পেত। চেঙ্গিস খানের দরবারে মুসলিম জ্যোতির্বিদ, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, এবং খ্রিস্টান পাদ্রিরা একসাথে বসে পরামর্শ দিতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সব ধর্মই এক ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার বিভিন্ন পথ। এই মহানুভবতা তাঁকে ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের কাছেও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল।

৩. 'অ্যারো মেসেঞ্জার' **(Arrow Messenger)** বা ডাক যোগাযোগ

চেঙ্গিস খান বিশ্বের প্রথম কার্যকর দ্রুতগামী ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন, যাকে বলা হতো 'ইয়াম' **(Yam)**। প্রতি ২৫-৩০ মাইল অন্তর একটি করে স্টেশন থাকত, যেখানে সবসময় তাজা ঘোড়া ও খাবার প্রস্তুত থাকত। এর ফলে একটি খবর বা চিঠি কয়েক হাজার মাইল পথ

মাত্র কয়েক দিনে পাড়ি দিতে পারত। বলা হতো, মঙ্গোল সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে একজন কুমারী মেয়ে মাথায় সোনার থালা নিয়ে নির্দ্বিধায় যাতায়াত করতে পারত—এতটাই নিরাপদ ছিল তাঁর শাসনব্যবস্থা।

৪. মেধা ও যোগ্যতার মূল্যায়ন **(Meritocracy)**

চেঙ্গিস খান তাঁর সাম্রাজ্যে বংশীয় আভিজাত্যের প্রথা ভেঙে দিয়েছিলেন। তিনি কোনো সেনাপতিকে পদ দিতেন না তাঁর বাবার পরিচয়ে, বরং দিতেন তাঁর সাহসিকতা ও মেধার ভিত্তিতে। তাঁর সবচেয়ে বড় দুই সেনাপতি জেবে এবং সুবুতাই এসেছিলেন সাধারণ পরিবার থেকে। এমনকি জেবে একসময় তেমুজিনকে যুদ্ধে তীর মেরে আহত করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বীরত্ব দেখে তেমুজিন তাঁকে ক্ষমা করে সেনাপতি বানিয়েছিলেন।

## মঙ্গোলিয়ার অদৃশ্য চোখ — গোয়েন্দা বাহিনী ও তথ্যযুদ্ধ

চেঙ্গিস খান বিশ্বাস করতেন, একটি যুদ্ধ জেতা হয় লড়াই শুরু হওয়ার অনেক আগেই। তাঁর কাছে তথ্য ছিল তলোয়ারের চেয়েও ধারালো।

- বণিক ও সন্ন্যাসী ছদ্মবেশে গুপ্তচর: তিনি সিল্ক রোডের বণিকদের তাঁর গোয়েন্দা হিসেবে ব্যবহার করতেন। এরা যখন অন্য দেশে ব্যবসা করতে যেত, তখন তারা শুধু পণ্য কিনত না, বরং সেই দেশের দুর্গের অবস্থা, সৈন্যদের সংখ্যা এবং রাজ পরিবারের কোন্দলের খবর নিয়ে আসত। বৌদ্ধ ও মুসলিম সন্ন্যাসীরাও তাঁর জন্য তথ্য সংগ্রহ করত, কারণ তারা অনায়াসেই সব জায়গায় যাতায়াত করতে পারত।
- মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ **(Psychological Warfare):** চেঙ্গিস খান জানতেন শত্রুকে মানসিকভাবে দুর্বল করতে পারলে অর্ধেক যুদ্ধ জয় হয়ে যায়। তিনি গুজব ছড়াতেন যে মঙ্গোলরা নরকের শয়তান এবং তারা পরাজিতদের হাড় দিয়ে পাহাড় বানায়। এটি শুনে অনেক শক্তিশালী সেনাবাহিনী লড়াই করার আগেই অস্ত্র ফেলে দিত।
- সামরিক মানচিত্র: মঙ্গোলরাই প্রথম নিখুঁত স্কেচ ম্যাপ ব্যবহার শুরু করে। তারা নদী, পাহাড় এবং গোপন রাস্তার খুঁটিনাটি ম্যাপে এঁকে নিত, যা তাদের দ্রুত আক্রমণে সাহায্য করত।

## স্থাপত্য ও শিল্পে মঙ্গোল ছাপ — কারাকোরাম নগরী

যাযাবর হওয়ার কারণে মঙ্গোলদের কোনো স্থায়ী শহর ছিল না, কিন্তু সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য চেঙ্গিস খান কারাকোরাম **(Karakorum)** নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন।

- সংস্কৃতির মিলনমেলা: কারাকোরাম ছিল এমন এক শহর যেখানে একসাথে বারোটি ভিন্ন ধর্মের উপাসনালয় ছিল। রেশম পথ দিয়ে আসা জ্ঞান ও প্রযুক্তি এখানেই জমা হতো।
- কারিগরদের সমাবেশ: চীন থেকে রেশম শিল্পী, পারস্য থেকে স্থপতি আর ইউরোপ থেকে স্বর্ণকারদের তিনি কারাকোরামে এনেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, তলোয়ার দিয়ে রাজ্য জয় করা যায়, কিন্তু জ্ঞান দিয়ে তাকে টেকসই করতে হয়।

## ইউরোপের দ্বারে মঙ্গোলরা — রুশ অভিযান ও কালকা নদীর যুদ্ধ

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর চেঙ্গিস খান তাঁর দুই শ্রেষ্ঠ সেনাপতি সুবুতাই এবং জেবে-কে ২০,০০০ সৈন্য দিয়ে এক বিশেষ অভিযানে পাঠান। তাঁদের কাজ ছিল কেবল পলাতক সুলতানকে ধরা নয়, বরং কাস্পিয়ান সাগরের চারপাশের এলাকাগুলো পর্যবেক্ষণ করা। এই ছোট সৈন্যদলটিই কয়েক বছরের মধ্যে রাশিয়ার বিশাল সমভূমি এবং ইউরোপের দরজায় কড়া নেড়েছিল।

১. ককেশাস পাড়ি ও দুর্ধর্ষ যাত্রা

সুবুতাই এবং জেবে তাঁদের বাহিনী নিয়ে আজারবাইজান এবং জর্জিয়া পার হয়ে ককেশাস পর্বতমালায় প্রবেশ করেন। পাহাড়ের দুর্গম পথ আর তুষারপাত উপেক্ষা করে মঙ্গোলরা যখন ইউরোপের সীমানায় পৌঁছাল, তখন সেখানকার নাইটরা **(Knight)** জীবনে কখনো মঙ্গোলদের মতো যোদ্ধা দেখেনি। মঙ্গোলরা ছিল বাতাসের মতো দ্রুত আর তীরের মতো নির্ভুল।

২. রাশিয়ার রাজপুত্রদের জোট

মঙ্গোলদের অগ্রযাত্রা দেখে রাশিয়ার কিভান রুস **(Kievan Rus)** অঞ্চলের রাজপুত্ররা আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। প্রিন্স মিস্টিস্লাভ **(Mstislav the Bold)** সহ একাধিক রুশ রাজা তাঁদের প্রায় ৮০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গঠন করলেন। মঙ্গোলদের মাত্র ২০,০০০ সৈন্যের বিপরীতে রুশদের সংখ্যা ছিল চারগুণ বেশি। রুশরা ভেবেছিল, এই 'যাযাবর' বাহিনীকে তারা অনায়াসেই পিষে ফেলবে।

৩. কালকা নদীর যুদ্ধ **(Battle of the Kalka River)**

১২২৩ সাল। কালকা নদীর তীরে ইতিহাসের অন্যতম ধূর্ত এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সুবুতাই এক অভাবনীয় রণকৌশল ব্যবহার করলেন— **'কৌশলী পশ্চাদপসরণ' (Feigned Retreat)।**

- নাটকীয় পলায়ন: মঙ্গোলরা টানা ৯ দিন রুশ বাহিনীর সামনে থেকে পালানোর ভান করল। রুশরা মনে করল মঙ্গোলরা ভয় পেয়েছে, তাই তারা সুশৃঙ্খলভাবে আগানোর বদলে এলোপাথাড়ি তাড়া করতে শুরু করল।
- ফাঁদ: রুশ বাহিনী যখন ক্লান্ত হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল এবং কালকা নদী পার হলো, ঠিক সেই মুহূর্তে সুবুতাই তাঁর ঘোড়া ঘোরানোর নির্দেশ দিলেন।

মুহূর্তের মধ্যে চিত্র বদলে গেল। পলায়নরত মঙ্গোলরা হঠাৎ দানবের মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে রুশদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রুশদের ভারি বর্ম আর লম্বা তলোয়ার মঙ্গোলদের হালকা ও দ্রুতগতির ঘোড়সওয়ারদের সামনে অকেজো হয়ে পড়ল। কালকা নদীর পানি রুশ যোদ্ধাদের রক্তে লাল হয়ে গেল। প্রায় ৭০,০০০ রুশ সৈন্য সেই যুদ্ধে প্রাণ হারাল।

৪. এক অমানবিক উৎসব

যুদ্ধের পর মঙ্গোলরা এক অদ্ভুত ও ভয়ংকর পদ্ধতিতে জয় উদযাপন করল। তারা পরাজিত রুশ রাজপুত্রদের এক জায়গায় শুইয়ে তার ওপর কাঠের তক্তা বিছিয়ে দিল। সেই তক্তার ওপর বসে সুবুতাই ও তাঁর সেনাপতিরা জয়ের ভোজ সারলেন, আর নিচে চাপা পড়ে রুশ রাজপুত্ররা যন্ত্রণায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন। এটি ছিল মঙ্গোলদের সেই কঠোর বার্তা— যারা মঙ্গোলদের বশ্যতা স্বীকার করবে না, তাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ।

## আধ্যাত্মিকতা ও রহস্যময় শামানবাদ

চেঙ্গিস খানের জীবনের সবচেয়ে রহস্যময় অংশ হলো তাঁর ধর্মবিশ্বাস এবং তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি।

- তেংরির দূত: তিনি নিজেকে **'ইটারনাল ব্লু স্কাই'** বা অনন্ত নীল আকাশের (তেংরি) চাবুক মনে করতেন। তাঁর প্রতিটি বিজয়ের পর তিনি তেংরিকে ধন্যবাদ জানাতেন।
- বুরখান খালদুন পাহাড়ে ধ্যান: জীবনের প্রতিটি কঠিন সময়ে তিনি এই পবিত্র পাহাড়ে একা চলে যেতেন। সেখানে তিনি তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত নিরাহারে উপাসনা করতেন।
- ধর্মীয় বিতর্ক: চেঙ্গিস খান অদ্ভুতভাবে উদার ছিলেন। তিনি তাঁর রাজসভায় মুসলিম ইমাম, বৌদ্ধ লামা এবং খ্রিস্টান পাদ্রিদের ডাকতেন এবং তাঁদের মধ্যে বিতর্ক লাগিয়ে

দিতেন। তিনি নিজে নীরব দর্শক হিসেবে বসে সেই গভীর আলোচনা শুনতেন এবং পরম সত্য খোঁজার চেষ্টা করতেন।

## মহাপ্রয়াণ — শেষ অভিযান ও রহস্যময় প্রস্থান

১২২৬ সাল। চেঙ্গিস খানের বয়স তখন ষাটের কোঠায়। তাঁর শরীর যুদ্ধের ক্ষত আর বয়সের ভারে ক্লান্ত, কিন্তু তাঁর ভেতরের সেই দাউদাউ করে জ্বলা আগুন এখনো নেভেনি। তিনি যখন তাঁর তাবু থেকে বের হয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকাতেন, তিনি অনুভব করতেন—সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। কিন্তু যাওয়ার আগে তাঁর একটি হিসেব বাকি ছিল; পশ্চিম জিয়ার **(Tangut)** বিশ্বাসঘাতকতার শোধ নেওয়া।

১. পশ্চিম জিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা

খাওয়ারিজম অভিযানের সময় পশ্চিম জিয়ার রাজা চেঙ্গিস খানকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং তাঁকে উপহাস করেছিলেন। চেঙ্গিস খান সেই অপমান ভোলেননি। তিনি তাঁর সন্তানদের বললেন, "আমি যদি মারাও যাই, তবু এই বিশ্বাসঘাতক জাতিকে ক্ষমা কোরো না।" শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজেই এই অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

২. সেই অশুভ দুর্ঘটনা

অভিযানের পথে একটি বুনো ঘোড়া শিকার করার সময় চেঙ্গিস খান ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে যান। তাঁর শরীরে অভ্যন্তরীণ প্রচণ্ড আঘাত লাগে এবং প্রবল জ্বর আসে। তাঁর সেনাপতিরা তাঁকে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু চেঙ্গিস খানের এক কথা— "যদি আমি ফিরে যাই, তবে তারা ভাববে আমি ভয় পেয়েছি।" যন্ত্রণাকে জয় করে তিনি লড়াই চালিয়ে গেলেন।

৩. জীবনের শেষ উপদেশ: সন্তানদের প্রতি বার্তা

মৃত্যু পথযাত্রী চেঙ্গিস খান তাঁর চার পুত্র— জচি (ততদিনে মৃত), চাগাতাই, ওগোদাই এবং তোলুইকে কাছে ডাকলেন। তিনি তাঁদের একগুচ্ছ তীর দিলেন এবং বললেন একটি করে তীর ভাঙতে। তারা সহজেই তা ভেঙে ফেলল। এরপর তিনি একগুচ্ছ তীর একসাথে দিলেন এবং বললেন ভাঙতে। কেউ পারল না। চেঙ্গিস খান ফিসফিস করে বললেন, "যতক্ষণ তোমরা এক

থাকবে, ততক্ষণ পৃথিবী তোমাদের পদানত থাকবে। কিন্তু যখন তোমরা বিচ্ছিন্ন হবে, তখন এই একটি তীরের মতোই ভেঙে পড়বে।" তিনি তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে শান্ত স্বভাবের ওগোদাই-কে বেছে নিলেন।

৪. ১২২৭: এক নক্ষত্রের পতন

১২২৭ সালের আগস্ট মাস। পশ্চিম জিয়া সাম্রাজ্য যখন পতনের মুখে, ঠিক তখনই চেঙ্গিস খান তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে আজও রহস্য রয়ে গেছে। কেউ বলে যুদ্ধের ক্ষত, কেউ বলে জ্বর, আবার কেউ বলে শত্রু পক্ষের কোনো চক্রান্ত। তবে মঙ্গোলদের জন্য সেদিন আকাশ যেন ভেঙে পড়েছিল। তাদের 'গ্রেট খান' আর নেই।

## অনন্ত নিস্তব্ধতা — গোপন সমাধি ও উত্তরাধিকার

চেঙ্গিস খান মৃত্যুর আগে এক অদ্ভুত ও কঠোর নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর সমাধি যেন এমন এক জায়গায় হয়, যা পৃথিবীর কোনো মানুষ কোনোদিন খুঁজে না পায়। তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃতির মাঝে নিঃশব্দে মিশে যেতে, কোনো জাঁকজমকপূর্ণ স্মৃতিস্তম্ভে নয়।

১. সেই রক্তক্ষয়ী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

১২২৭ সালের সেই শোকাতুর দিনে চেঙ্গিস খানের মৃতদেহ মঙ্গোলিয়ায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছিল। এই যাত্রাটি ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে নীরব এবং ভয়ংকর যাত্রা। নির্দেশ অনুযায়ী, যাত্রাপথে যে দাফনকারী দলের সামনে পড়েছে, তাকেই হত্যা করা হয়েছে। এমনকি যারা সমাধি খনন করেছিল, তাদেরও হত্যা করা হয় যেন কবরের অবস্থানটি চিরতরে গোপন থাকে।

মঙ্গোলীয় লোকগাথা অনুযায়ী, তাঁকে তাঁর প্রিয় 'বুরখান খালদুন' পাহাড়ে দাফন করা হয়। দাফনের পর সেই জায়গার ওপর দিয়ে এক হাজার ঘোড়া বারবার চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেন মাটির কোনো চিহ্ন না থাকে। এমনকি একটি নদীকেও তাঁর কবরের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। আজ ৮০০ বছর পার হয়ে গেলেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেও কেউ তাঁর কবরের হদিস পায়নি।

২. সাম্রাজ্যের বন্টন: চার পুত্রের উত্তরাধিকার

চেঙ্গিস খান তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে চার ভাগে (উলুস) ভাগ করে দিয়েছিলেন তাঁর চার পুত্রের বংশধরদের জন্য। এই বন্টনই পরবর্তী কয়েকশ বছর এশিয়া ও ইউরোপের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে:

- ওগোদাই খান: তিনি হলেন 'গ্রেট খান'। মঙ্গোলিয়ার মূল কেন্দ্র এবং চীন জয়ের দায়িত্ব তাঁর ওপর পড়ে।
- জচির বংশধর (গোল্ডেন হোর্ড): বর্তমান রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের বিশাল এলাকা পান জচির ছেলেরা (বাতু খান)।
- চাগাতাই খান: মধ্য এশিয়া এবং খাওয়ারিজমের এলাকাগুলো তাঁর ভাগে পড়ে।
- তোলুই খান: মঙ্গোলিয়ার পিতৃভূমি এবং পরবর্তীতে তাঁর পুত্র হালাকু খান পারস্য ও বাগদাদ বিজয় করেন।

৩. পাক্স মঙ্গোলিকা (**Pax Mongolica**)

চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরিরা এমন এক ব্যবস্থা তৈরি করেন যেখানে পুরো এশিয়াজুড়ে শান্তি ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একে বলা হয় 'মঙ্গোলীয় শান্তি'। রেশম পথ দিয়ে পূর্বের রেশম পশ্চিমে আর পশ্চিমের প্রযুক্তি পূর্বে আসতে শুরু করে। তাঁর নাতি কুবলাই খান চীনে 'ইউয়ান রাজবংশ' প্রতিষ্ঠা করে ইতিহাস গড়েছিলেন।

## ইতিহাসের মহাকাল — মূল্যায়ন ও অমরত্ব

চেঙ্গিস খান—একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি ঝড়। আটশ বছর পার হয়ে গেলেও এই নামটি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যায়নি। আধুনিক ইতিহাসের আয়নায় দাঁড়ালে আমরা দেখি চেঙ্গিস খান কেবল একজন বিজেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন পৃথিবীর রূপ বদলে দেওয়া এক কারিগর।

১. ধ্বংস না কি নির্মাণ?

ইউরোপীয় ও মুসলিম ইতিহাসবিদরা দীর্ঘকাল তাঁকে ‘রক্তপিপাসু’ বা ‘ধ্বংসকারী’ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। সমরকন্দ, বুখারা বা বেইজিংয়ের ধ্বংসলীলা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু মুদ্রার অন্য পিঠ বলছে ভিন্ন কথা। চেঙ্গিস খান বিশ্বকে যা দিয়েছিলেন, তা তলোয়ারের চেয়েও শক্তিশালী ছিল।

- বিশ্বায়ন: তাঁর কারণেই প্রথম এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়।
- লিখন পদ্ধতি: তিনি মঙ্গোলদের জন্য প্রথম বর্ণমালা (উইঘুর স্ক্রিপ্ট) চালু করেন।
- মেধাভিত্তিক সমাজ: রক্তের সম্পর্কের চেয়ে যোগ্যতাকে বেশি দাম দিয়ে তিনি এক নতুন রাজনৈতিক দর্শনের জন্ম দিয়েছিলেন।

২. আধুনিক বিশ্বে চেঙ্গিস খানের ছায়া

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, আজকের আধুনিক বিশ্বের অনেক কিছুর মূলে রয়েছে চেঙ্গিস খানের উদ্ভাবন।

- কাগজের মুদ্রা: মঙ্গোলরাই প্রথম বড় পরিসরে কাগজের মুদ্রার প্রচলন করে।
- কূটনৈতিক দায়মুক্তি: দূতদের হত্যা না করার এবং তাঁদের নিরাপত্তা দেওয়ার যে আধুনিক নিয়ম, তা চেঙ্গিস খানই প্রথম কঠোরভাবে কার্যকর করেছিলেন।
- ধর্মীয় সহনশীলতা: যখন ইউরোপে ভিন্ন ধর্মের মানুষকে পুড়িয়ে মারা হতো, তখন চেঙ্গিস খানের অধীনে বৌদ্ধ, মুসলিম ও খ্রিস্টানরা শান্তিতে বসবাস করত।

৩. রক্তের উত্তরাধিকার

আধুনিক জেনেটিক বিজ্ঞানের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমান বিশ্বের প্রতি ২০০ জন পুরুষের মধ্যে একজনের শরীরে চেঙ্গিস খানের ডিএনএ **(DNA)** রয়েছে। তিনি কেবল সাম্রাজ্য নয়, বরং একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবন ও রক্তে মিশে আছেন। মঙ্গোলিয়ার মানুষ আজও তাঁকে তাঁদের জাতির পিতা এবং ‘পবিত্র চেঙ্গিস’ হিসেবে পূজা করে।